চোরাই জীবাণু

এইচ জি ওয়েলস

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

চোরাই জীবাণু

(The Stolen Bacillus)

মাইক্রোস্কোপের তলায় কাচের প্লেট ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন জীবাণুবিজ্ঞানী, এই হল গিয়ে স্বনামধন্য কলেরা-ব্যাসিলাস–কলেরার জীবাণু।

পাঙাসপানা মুখ নিয়ে অণুবীক্ষণে একটা চোখ রাখল লোকটা। মাইক্রোস্কোপ দেখতে অভ্যস্ত নয় নিশ্চয়, তাই শীর্ণ শিথিল একটা সাদা হাতে চাপা দিলে অন্য চোখটা।

বললে, কিসসু দেখতে পাচ্ছি না।

স্ক্রু-টা ঘুরিয়ে আপনার চোখের উপযোগী করে মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করে নিন। সবার চোখে সমান দৃষ্টি তো থাকে না। এইদিকে সামান্য একটু ঘোরান।

এই তো... দেখা যাচ্ছে। আহামরি অবশ্য কিছু নয়। গোলাপি রঙের পুঁচকে কতকগুলো ডোরা আর ফালি। অথচ দেখুন, এই খুদে পরমাণু থোকারাই গোটা শহরকে তছনছ করে দিতে পারে। ওয়ান্ডারফুল!

বলে, কাচের স্লাইডটা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের ধার থেকে সরে গেল জানলার পাশে। আলোর সামনে স্লাইড তুলে ধরে বললে, দেখাই যাচ্ছে না। বেঁচে আছে তো? এখনও কি বিপজ্জনক?

রং দিয়ে রাঙিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যদি পারতাম, বিশ্বের সমস্ত কটা জীবাণুকে এইভাবে মারতাম।

ক্ষীণ হাসি ভেসে ওঠে বিবর্ণমুখ লোকটার ঠোঁটে–জীবন্ত জীবাণু, আপনার ঘরে রাখতে চান না–এই তো?

মোটেই তা নয়। জীবন্ত জীবাণুই তো রাখতে হয়। যেমন ধরুন এই জীবন্ত জীবাণুগুলো, বলতে বলতে ঘরের আরেকদিকে গিয়ে মুখ-আঁটা একটা টিউব তুলে নিলেন জীবাণু-

বিজ্ঞানী–রোগজীবাণুর চাষ করে পাওয়া এই দেখুন বেশ কিছু সজীব জীবাণু। বোতল-কলেরাও বলতে পারেন।

ক্ষণেকের জন্যে যেন পরম খুশির হালকা হাসি ভেসে যায় সাক্ষাৎপ্রার্থীর পাতলা ঠোঁটের ওপর দিয়ে। দুচোখ দিয়ে যেন গিলতে থাকে ছোট্ট টিউবটা।

নজর এড়ায় না জীবাণু-বিজ্ঞানীর। লোকটার চোখে-মুখে অস্বাস্থ্যকর রুগ্‌ণ আনন্দের দ্যুতি। প্রথম থেকেই খটকা লেগেছিল জীবাণু-বিজ্ঞানীর। হাবভাব কীরকম যেন খাপছাড়া। অথচ পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছে এক বন্ধুর কাছ থেকে। বিজ্ঞানসাধকরা হয় শান্তশিষ্ট, আত্মচিন্তায় সদানিমগ্ন। কালোচুলো এই লোকটার গভীর ধূসর চোখে কিন্তু উদ্ভ্রান্ত চাহনি, হাবভাব ছটফটে-নার্ভাস। চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ চাহনি নিবদ্ধ কাচের টিউবের ওপর, ঠিক এই ধরনের বিজ্ঞানসাধকের সংস্পর্শে কোনওদিন আসেননি জীবাণু-বিজ্ঞানী। হয়তো তাঁর আবিষ্কার লোকটাকে চঞ্চল করে তুলেছে, এমনটা হওয়াও বিচিত্র নয়।

টিউব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী চিন্তাকুটিল ললাটে। বললেন নিবিষ্ট স্বরে, মহামারীকে বন্দি করে রেখেছি এই টিউবের মধ্যে। খাবার জলের চালান যাচ্ছে যেখান থেকে, ছোট্ট এই টিউবটাকে যদি ভেঙে ফেলেন সেই জলের মধ্যে, তাহলেই দেখবেন এই খুদে অণুবীক্ষণে দৃশ্যমান প্রাণীগুলোর ক্ষমতা। অথচ এদের গায়ে গন্ধ নেই, খেতেও বিস্বাদ নয়–অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ না হলে দেখাও যায় না। কিন্তু তুচ্ছ প্রায়-অদৃশ্য এই এদেরকে জলে ঢেলে দিয়ে যদি হুকুম দেন–যাও হে মৃত্যুদূতেরা, বংশবৃদ্ধি করে ছেয়ে ফেল সব কটা সিসটার্ন আর চৌবাচ্চা–তাহলেই ভয়ানক মৃত্যু আসবে চক্ষের নিমেষে, রহস্যময় সেই মৃত্যুর কিনারা করাও যাবে না, যন্ত্রণাময় মৃত্যু অসীম লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে এক-একটা মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে মৃত্যুকূপে। সারা শহর জুড়ে তাথই তাথই নাচ নেচে চলবে মৃত্যু-যজ্ঞের সৈনিকরা–এই প্রায়-অদৃশ্য জীবাণুরা। নিজেরাই শিকার খুঁজে বার করবে–কাউকে দেখিয়েও দিতে হবে

না। স্বামীকে ছিনিয়ে নেবে স্ত্রীর কাছ থেকে, শিশুকে মায়ের কোল থেকে, রাজনীতিবিদকে কঠিন কর্তব্যের মধ্যে থেকে। শ্রমিককে আর উদয়াস্ত হাড়ভাঙা মেহনত নিয়ে কষ্ট পেতে হবে না। এগিয়ে যাবে জলের মেইন পাইপ দিয়ে, গুটিশুটি এগবে রাস্তা বরাবর, যেসব বাড়িতে জল ফুটিয়ে খাওয়ার হাঙ্গামা কেউ পোয়াতে চায় না–ঠিক সেইসব বাড়িতেই হানা দিয়ে সাজা দেবে মৃত্যুর পরোয়ানা হাজির করে, খনিজ জল উৎপাদন করে যারা–সেঁধিয়ে বসবে তাদের কুয়োর জলে, মিশে যাবে স্যালাডে, ঘুমিয়ে থাকবে বরফের মধ্যে। ঘোড়াদের জল খাবার চৌবাচ্চায় ওত পেতে থাকবে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ নিয়ে উদরে প্রবেশের অপেক্ষায়, রাস্তার কল থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন নিশ্চিন্ত মনে জল খাবে–তখন তাদেরও একে একে টেনে নিয়ে যাবে মৃত্যুর অজানা লোকে। মাটি শুষে নেবে মহাভয়ংকর এই সৈনিকদের, কিন্তু আবার বেরিয়ে আসবে হাজার হাজার অপ্রত্যাশিত পথে-ঝরনার জলে, কুয়োর জলে। জলাধারে একবার ছেড়ে দিলেই হল–ডেকে ফিরিয়ে এনে ফের বন্দি করার সুযোগ বা সময়ও আর দেবে না–মহাশ্মশান করে ছাড়বে বিশাল এই শহরকে।

অকস্মাৎ স্তব্ধ হলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী। বাগ্মিতা তাঁর এক দুর্বলতা। সবাই বলে, নিজেও জানেন।

শেষ করলেন ছোট্ট কথায়, এই টিউবের মধ্যে মহামারীর মৃত্যুদূতরা কিন্তু সুরক্ষিত।

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দেয় বিবর্ণমুখ লোকটা। কিন্তু চকচক করছে দুই চোখ। কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললে, তাহলেই দেখুন, অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যে যারা আদা জল খেয়ে লেগেছে, সেই অ্যানার্কিস্টগুলোর মতো মহামূর্খ আর নেই। বোমা-টোমার দরকার কী? হাতের কাছেই রয়েছে যখন এমন নিঃশব্দ, মোক্ষম অস্ত্র। আমার তো মনে হয়–

মৃদু টোকা শোনা গেল দরজায়। নখ দিয়ে কে যেন টোকা মারছে।

দরজা খুলে দিলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী।

সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী। বললেন, একটা কথা আছে, বাইরে আসবে?

স্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে জীবাণু-বিজ্ঞানী দেখলেন, ঘড়ি দেখছে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বললে, চারটে বাজতে বারো মিনিট। ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করলাম আপনার। যাওয়া উচিত ছিল সাড়ে তিনটেয়। কিন্তু এমন কৌতূহল জাগিয়ে ছেড়েছিলেন যে খেয়ালই ছিল না। এখন চলি–ঠিক চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

আর-এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ফিরে এলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী। সাক্ষাৎপ্রার্থীর মানবজাতিতত্ত্ব নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করছিলেন তিনি। লোকটা টিউটোনিক টাইপ নয়, মামুলি ল্যাটিন টাইপও নয়। রুগণ মনুষ্য–দেহে এবং মনে। রোগ তৈরির ডিপো জীবাণুগুলোর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল!

ভাবতে ভাবতেই একটা অস্বস্তিকর চিন্তা ঢুকে গেল মাথায়। ভেপার বাথের পাশে রাখা বেঞ্চির দিকে গেলেন, সেখান থেকে ঝটিতি গেলেন লেখবার টেবিলে। পাগলের মতো পকেট হাতড়ালেন এবং পরক্ষণেই তিন লাফে হাজির হলেন দরজায়। হয়তো হলঘরের টেবিলে রেখেছেন–কিন্তু সেখানেও জিনিসটা না পেয়ে বিকট গলায় ডাকলেন স্ত্রী-র নাম ধরে।

দূর থেকে সাড়া এল স্ত্রী-র।

বললেন জীবাণু-বিজ্ঞানী গলার শির তুলে, যখন কথা বলছিলাম তোমার সঙ্গে, আমার হাতে কিছু দেখেছিলে?

কিছুক্ষণ কোনও জবাব এল না।

কই না তো!

আর্তনাদ করে উঠলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী, নীল সর্বনাশ! ঝড়ের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন সদর দরজা পেরিয়ে এক্কেবারে রাস্তায়।

স্ত্রী-র নাম মিনি। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠতেই সভয়ে দৌড়ে গেল জানলার সামনে। দেখল, পাঁইপাঁই করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে একজন শীর্ণকায় পুরুষ তারপরেই একটা ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড় করিয়ে উঠে বসছে ভেতরে। পেছনে দৌড়াচ্ছেন তাঁর স্বামী। মাথায় টুপি নেই। পায়ে কার্পেট-চটি। ক্ষিপ্তের মতো হাত নাড়ছেন সামনের ছ্যাকড়া গাড়িটার দিকে। ছুটতে ছুটতে পা থেকে ছিটকে গেল একখানা চটি–কিন্তু কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যেও দাঁড়ালেন না–এক পায়ে চটি পরেই দৌড়াচ্ছেন উন্মাদের মতো। মিনি দেখলে, স্বামীদেবতার মাথাটি সত্যিই এদ্দিনে বিগড়ে গেল। ভয়ানক বিজ্ঞান নিয়ে দিনরাত অত ভাবলে মাথা খারাপ তো হবেই।

জানলা খুলে স্বামীকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছে মিনি, এমন সময়ে শীর্ণকায় লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই একই পাগলামিতে যেন পেয়ে বসল তাকেও। চকিতে হাত নেড়ে দেখাল জীবাণু-বিজ্ঞানীকে, কী যেন বললে গাড়োয়ানুকে, লাফিয়ে উঠে বসল ভেতরে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সপাং সপাং করে চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে! রাস্তা কাঁপিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেল গাড়ি

পেছনে পেছনে জীবাণু-বিজ্ঞানী ছুটলেন পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে এক পায়ে চটি পরে।

মিনিটখানেক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকার পর বিমূঢ়ভাবে জানলা বন্ধ করে দিলে মিনি। পতিদেবতা নির্ঘাত পাগল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাঁ করে বসে থাকলে তো চলবে না। জীবাণু-বিজ্ঞানীর টুপি, জুতো আর ওভারকোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে বসে গাড়োয়ানকে বললে, মাথায় টুপি না দিয়ে ভেলভেট কোট

পরে একটা লোক দৌড়াচ্ছে–চল তো তার কাছে। হ্যাভলক কেসেন্টের দিকে গেলেই পাবে।

চাবুকের ঘায়ে গাড়িখানাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল তেজিয়ান ঘোড়া। হইচই পড়ে গেল পথের দুপাশে। পরপর দুখানা গাড়ি পথ কাঁপিয়ে ছুটছে নক্ষত্রবেগে। পটাপট হাততালিতে মুখরিত হল আকাশ-বাতাস। ভদ্রমহিলা যে সামনের গাড়ির নাগাল ধরতে চাইছে, এটা বুঝেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

মিনি নিজেও বুঝল, এত উত্তেজনা তাকে নিয়েই। কিন্তু সে চলেছে তার কর্তব্য করতে। সামনের গাড়ির দিকে তার নজরই নেই–চোখ রেখেছে কেবল তার উন্মাদ স্বামীর পৃষ্ঠদেশে।

সামনের গাড়ির ভেতরে এক কোণে ঝুঁকে বসে রয়েছে সেই লোকটা। শক্ত মুঠোর মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের বীজ কলেরার জীবাণু ভরতি টিউবটা। ভয় আর উল্লাস–এই দুই ভাবের খেলা চলছে মাথার মধ্যে। ভয়টা আবার দুরকমের। কর্তব্য সম্পাদনের আগেই না ধরা না পড়তে হয়। দ্বিতীয় ভয়টা তার অপরাধজনিত। কিন্তু এই দু-দুটো ভয়কে ছাপিয়ে গেছে উৎকট উল্লাস। মনেপ্রাণে সে একজন অ্যানার্কিস্ট–অরাজকতা সৃষ্টি করার বিকৃত বাসনা শেকড় গেড়ে রয়েছে তার অণুতে-পরমাণুতে। কিন্তু অন্য কোনও অ্যানার্কিস্ট যা কল্পনাও করতে পারেনি–সে তা কল্পনা তো করেইছে, কাজে রূপান্তরিত করতে চলেছে। অহো! অহো! র‍্যাভাচোল, ভ্যালিয়ান্ট এবং আরও কত অ্যানার্কিস্ট এখন বিস্মৃত–কিন্তু সে অমর হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। তাকে পাত্তা দেয়নি কেউ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে প্রত্যেকেই–মোক্ষম প্রতিশোধ নেবে এখুনি। খাসা মতলব এনেছিল মাথায়। পরিচয়পত্র জাল করে দেখা করেছিল উজবুক ওই জীবাণু-বিজ্ঞানীটার সঙ্গে, কথায় কথায় ভুলিয়ে রেখে সুযোগ বুঝেই পকেটে ঢুকিয়েছে বিশেষ টিউবটা। এখন শুধু জলাধারে উপুড় কয়ে দিলেই হল। হাঃ হাঃ হাঃ! মৃত্যু নেচে নেচে বেড়াবে সারা শহরে। কিন্তু

উজবুকটা এখনও পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে নাকি? মুখ বাড়িয়ে দেখল অ্যানার্কিস্ট। মাত্র পঞ্চাশ গজ পেছনে এসে গেছে আহাম্মকটা গাড়ি। উঁহু, এত কাছাকাছি আসতে দেওয়াটা ঠিক নয়। একটা আধ গিনি গাড়োয়ানের হাতে গছিয়ে গাড়িটাকে আরও জোরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিলে অ্যানার্কিস্ট।

আধ গিনি কম কথা নয়। সপাং করে চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে। আচমকা মার খেয়ে তিড়বিড়িয়ে ছিটকে ধেয়ে গেল ঘোড়া–সেই সঙ্গে গাড়ি। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল অ্যানার্কিস্ট-হাতের মুঠোয় মূল্যবান সেই ধ্বংসের বীজ। দুলন্ত গাড়িতে খাড়া থাকা যায়? ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে উলটে পড়তেই পিড়িং করে ভেঙে গেল পাতলা কাচের টিউবধ্বংসের বীজ গড়িয়ে গেল গাড়ির মেঝেতে!

ধপ করে বসে পড়ল অ্যানার্কিস্ট। মুখ চুন করে চেয়ে রইল হাতে ধরা ভাঙা টিউবটার দিকে! জীবাণু যখন গাড়ির মেঝেতে কিলবিল করছে, তখন মৃত্যুও ছড়িয়ে পড়বে অচিরেই। কিন্তু নাটকটা আর হল না।

ভাঙা টিউবে টলটল করছে একটা ফোঁটা। মৃত্যুদূত নিশ্চয়ই থুকথুক করছে তার মধ্যে। খেয়ে নেওয়া যাক–শহিদ হয়ে প্রশস্ত করে যাক মৃত্যুবাহিনীর বিজয়পথকে।

কলেরার জীবাণু এখন অ্যানার্কিস্টের পেটে। ভীষণ শক্তিশালী জীবাণু তো। মাথার মধ্যে কীরকম যেন করছে। কিন্তু খামকা আর আহাম্মক বৈজ্ঞানিকটাকে উদ্‌বেগের মধ্যে রাখা কেন? কাজ তো হাসিল!

ওয়েলিংটন স্ট্রিটে গাড়ি ছেড়ে দিল অ্যানার্কিস্ট। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে মৃত্যু-মহিমায় উন্নতশিরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জীবাণু-বিজ্ঞানীর প্রতীক্ষায়।

এসে গেছে আহাম্মকটা! উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অ্যানার্কিস্ট।

বেঁচে থাক অ্যানার্কিস্ট! হে বন্ধু, বড় দেরি করে ফেললে। জিনিসটা এখন আমার পেটের মধ্যে। মুক্তি পেয়েছে কলেরা খাঁচার মধ্যে থেকে।

জীবাণু-বিজ্ঞানী বুদ্ধি করে মাঝপথে একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন বলেই নাগাল ধরতে পেরেছিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক অ্যানার্কিস্টের। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তার কথাটা শুনে সবিস্ময়ে কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু না শুনেই সাড়ম্বরে বিদায় অভিনন্দন। জানিয়ে হেলেদুলে ওয়াটার ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল অ্যানার্কিস্ট-ভাঙা টিউবের জীবাণু পোশাকে পড়েছিল–ভেজা পোশাক ঘষটে গেল বহু পথচারীর গায়ে যত তাড়াতাড়ি রোগটা ছড়িয়ে পড়ে, ততই ভালো!

গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখছেন জীবাণু-বিজ্ঞানী, এমন সময়ে মিনি এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে হাতে জুতো, টুপি আর ওভারকোট।

দেখে সংবিৎ ফেরে জীবাণু-বিজ্ঞানীর, ভারী বুদ্ধি তো তোমার! মনে করে ঠিক এনেছে।

বলেই আবার তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন বিলীয়মান অ্যানার্কিস্টের দিকে। আচম্বিতে হেসে উঠলেন হো হো করে একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায়, বললেন হাসতে হাসতেই, মিনি, লোকটা নাম ভাঁড়িয়ে এসেছিল কলেরার জীবাণু চুরি করবে বলে–অ্যানার্কিস্ট তো লন্ডনের জলে কলেরার জীবাণু ছেড়ে দেওয়ার মতলব, কিন্তু ভুল করে কী নিয়ে গেছে জান? প্রথম ভুলটা অবশ্য আমারই। এশিয়াটিক কলেরার জীবাণু ভরতি টিউবের বদলে দেখিয়েছিলাম সেই টিউবটা–যে টিউবের জীবাণু খেয়ে ছোপ ছোপ নীল দাগে ভরে উঠেছিল বাঁদরগুলো, তিন তিনটে ছানা সমেত বেড়াল-মা বিলকুল নীল হয়ে গিয়েছিল। ঘন নীলবর্ণ ধারণ করেছিল চড়ুই পাখিটা। সেই জীবাণুই ও খেয়েছে। –জানি না কী হবে এখন–কিন্তু ওভারকোট পরতে যাব কেন? গরমে হাঁসফাঁস করছি দেখছ না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাও!